KAND RAJ COLLEGE

4TH SEM (BENG-H-CC-T-8 (পর্ব-2 - প্রবন্ধ- রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ)
- সন্জীদা খাতুন

প্রবন্ধের মূল ভাবনা (সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ)

(ক)

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি (২০০৮) প্রাপ্ত লেখিকা সন্জীদা খাতুন দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। আশৈশব সুরেই রবীন্দ্রতন্ময়ী এই নারী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি নিয়ে উত্তীর্ণ হন, এখানেই গবেষণার জন্য বিষয়টি নির্বাচন করেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৮ সালে 'পি-এইচ.ডি' ডিগ্রি লাভ। 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ' গবেষণার বিষয় জন্য। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-কর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক অনুরাগের ফল: - 'রবীন্দ্রনাথ: চিঠির সন্ধান' (১৯৯৪), 'তোমারি অতীতকালের তিরে' (১৯৯৪), 'রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে' (২০০০), 'আমার সোনার বাংলা' (২০০৫), 'রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ' (২০০৫), 'রবীন্দ্রনাথের গান: মনের আলোয়' (২০১১), 'রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য' (২০১১), 'তাঁর গানে আমার আমি' (২০১১) এই চিঠি গ্রন্থসমূহ।

(খ)

দুই বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি প্রাসঙ্গিক এবং সংস্কৃতির সংঘাতের রবীন্দ্রনাথ কিভাবে আলোকের দিশারী হয়ে ওঠেন সেই ভাবনা ও অনুভবের শ্রেষ্ঠ ফসলই আলোচ্য প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ' (রবীন্দ্রনাথ: চিঠির সন্ধানে) লিখেছেন, সন্জীদা খাতুন 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলাদেশ' প্রবন্ধে বাঙালি ভারতবাসী মুসলমানের মন ও মননে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করে চলেছে, সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগ এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে ~~রবীন্দ্রনাথের উদ্বেগও হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়ে~~ রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব—সে বিষয়ে (লেখিকা) সুচিন্তিত মতামত পোষণ করেছেন, প্রবন্ধের সূচনাতেই এই মহান স্রষ্টার সম্পর্কে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ কেন আগ্রহী জানালেন:—

"তিনি সমস্ত উপমহাদেশের হলেও, বাংলাদেশের সংস্কৃতির ভিত গড়ে দিয়ে তাঁকে আমরা আমাদের পথের সাথী এবং বাঙালি জাতিসত্তার প্রতীক হিসাবেই জেনেছি।"

বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক (কাজী মোতাহার হোসেন) কন্যা, সন্জীদা খাতুন নিজেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে অবিস্মরণীয় মূল্যবোধে দীক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন।

শ্রীমা ভট্টাচার্য
২০/০৪/২০২০

জাতিবিদ্বেষ

জীবনের যে দেশ সংগঠনের রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য দুই বাংলার সচেতন মানুষের কাছে শুধু তাৎপর্যপূর্ণই নয়, তাদের আলোচিত উদ্দীপিত করে চলেছে।

(ক)

রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শনে, পদ্মাতীরস্থ শিলাইদহে একটি সময়ে অধিক কাল অবস্থানপূর্বে, সেখানকার মুসলমান প্রজাদের সঙ্গে যুক্ত হন, এবং সেই পল্লীবাসী মানুষের সঙ্গে মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সমাজ জীবনের প্রসঙ্গ অনুভব করে ধন্য হন। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে ছিল দুজন শিক্ষিত নাগরিক মুসলমানদের সংস্পর্শে আসা করির ভাবনায়। তাদের মধ্যে সমাজতন্ত্র পরিবর্তে জাতীয়তা ছিল, তেমনি শিক্ষিত, দেশহিতৈষী হিন্দুর চিত্তের রাজনীতির ক্ষেত্র পাশে থাকলেও (তাই সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে) চিরকাল মুসলমানদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলেছে। মুসলমানকে হিন্দুদের আপন বলে ভাবতে পারেনি। ১৯১৪-১৯৩৭ প্রায় ২৫ বছরের মধ্যে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সামাজিক রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে (যেমন 'লোকহিত', 'হিন্দুমুসলমান') সচেতন মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে, এই ভাবনা যে নির্দিষ্ট কালসীমায় বাঁধা নয়, তা বলা যে সুদূর প্রসারী-প্রাবন্ধিক সেই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদের উপর আলোকপাত করেছেন।

(খ)

বাংলা ভাগাভাগির কেন্দ্র করে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে (হিন্দু-মুসলমান) যে বিভেদমূলক মানসিকতার সৃষ্টি, যে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কী ছিল তৃতীয় উল্লেখে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন লেখিকা,

কাজী নজরুল ইসলামের 'ফাতেহা ইয়াজদহম' কবিতার একটি পঙ্‌ক্তিতে ('উদিবে যে রবি আমাদেরি খুনে রঙিয়া পূর্বাচল') - খুনে (রক্তে) শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপত্তির কথা জানান এক সাময়িক পত্রিকায় ('কাঁটার কথা')। তাঁর বক্তব্য ছিল 'রক্তের অর্থে 'খুন' ব্যবহার করলে সেটা বেখাপ্পা হবার,... কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলেনি' ('বাংলা শব্দতত্ত্ব'-এ বিশ্বভারতীর সংস্করণ)। কবি নজরুল এই প্রসঙ্গে তাঁর স্বেচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। বড়ো নিরিখে কবির বাঁচা-মরা। এই নিয়ে সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে, বাংলার-উভয় বঙ্গের চলেছে। লেখিকার মতে, 'প্রসঙ্গটি সংস্কৃতি প্রবাহ অবলম্বন করে ভাষাগত দোষ ত্রুটির বিচার।

শ্রীবাসুদেব
১০/০৪/২০২০

পরবর্তী পর্যায়ের লেখিকা জাহানারা বেগম রামপাশা মজুমদার তাঁর 'মক্তব মাদ্রাসার বাংলা ভাষা' (প্রবাসী পত্রিকা- বৈশাখ-১৩৩২) প্রবন্ধে এবং পণ্ডিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রণীত 'মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা বই ও তার ভাষা' এবং অন্য এক লেখকের লেখা গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকার আরবি-ফারসি প্রতিশব্দের উল্লেখ করেন। যেমন:—

প্রদীপ = চেরাগ, ধর্মনীতি = দীনদারি, বিদ্যা = এল্‌ম, ধনী = মালদার, বিদ্যালয় = মক্তব।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় এই জাতীয় আরবি ফারসি শব্দের ব্যবহার মেনে নিতে পারেননি, তাই প্রবাসীতে (১৩৩২ ভাদ্র সংখ্যায়) উক্ত প্রবন্ধের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:- 'সহজ সুর: স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা ভাষায় আসা আরবি ফারসি (যেমন- হারাম, মেজাজ, খেয়াল, বেশারম ইত্যাদি) শব্দ বদল করার কথা উঠলেই আপত্তি, 'শিশুশিক্ষা' বাংলা বই-এ পাঠ্যপুস্তকে 'আরবি-পারসি-ওয়ালা' কথাগুলোকে আচারবিষ্ট মুসলমান যদি সাধু বলে মান করেন তবে ইংরেজি স্কুল পাঠ্যের ভাবগতিক এর নিদর্শন পাওয়া যাবে না।' প্রসঙ্গক্রমে তিনি তুলনার সূত্রে জীবনের 'রাই-পরিবার' কবিতাটির ফারসি নিদর্শন শোধন করার উদাহরণ দিয়েছেন।

১৯৩৪ সালে লেখা পত্রে শিক্ষিত-সংস্কৃতিমনস্ক আলোচনার চৌহদ্দীতে পত্রে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে তার মাতৃভাষা পর্যায়ের হিন্দু-মুসলমান সম্ভাব নেই, যেসব প্রাদেশে হিন্দুরা উর্দু ব্যবহার করে থাকেন তারাও আড়ালআবডালে নিজের প্রদেশ উর্দুভাষায় সংস্কৃত শব্দ মিশেল করেন- এই ধারার প্রসারও কাঙ্ক্ষিত নয়, কবি তাঁর আবেগ ও আশঙ্কার কথা:- "হতভাগ্য এই দেশ যেখানে ভদ্রতা বিদ্যার যেখানে সাংঘাতিক দুর্গতি সেই তো বাঁচোয়া। (বাংলা ভাষাতত্ত্ব - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

লেখিকা মনে করেন ভাষা আর সাহিত্য সর্বসাধারণের সম্পদ, সুতরাং তার সাহিত্যের যেন সমদর্শিতার অভাব হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক ~~দ্বন্দ্বের~~ দ্বন্দ্বের মতো ভাষাসাহিত্যে যেন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ আধুনিক সাহিত্যের আসরটিকে যেন অন্তত ইঙ্গিতবহ- বলেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন।

শাহাবুদ্দীন
২০১০৪১২২০

প্রাবন্ধিক কবিগুরু তাঁর আলোচনায়, 'উই স্থির করেছি দ্বি-জাতিতত্ত্ব', ১৯৪৭ এর পর অবিভক্ত বাংলা পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবঙ্গ - এই দুভাগে বিভক্ত হল, রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার সঙ্গে দেখা যেতে পারে, (১৯৪১, তাঁর মৃত্যুর বছর)। লেখিকার স্বীকারোক্তি 'মুসলমানী বাংলায়' নবেন্দু পালের গানের এর আদর্শ হয়ে উঠেছে। 'কবিতার খুনে ওয়াতোলের ঝুলি কবিতাগুলি' অবশ্যই তবে অধিক হলে ভাল হত, ভাবতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'পাকিস্তান' ভাবনায় ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেছেন - এ সবকিছুই সাহিত্যিক ভাব (রসসমন্বিত) হতে পারেনি, কিন্তু দুয়ের উদ্দীপনায় পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবতা এই ভাবের সূত্রে সূত্র মিলিয়েছেন, অচিরেই। ... সাধুভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষা মিলিয়ে আমাদের ঐক্য নতুন।'

(২)

সন্তোষ খাতুন সেকেলের মনস্বীদের অনুভূতিগুলি সম্মুখে রাখে অনুভব করেছেন এই সংকটে রবীন্দ্রনাথ মাত্র মারাত্মক, এমন পুরনো সম্মুখে কেউ 'আমার ভাষা' সাহিত্যে। -- সুফিয়া কামাল পরিচিত 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণেও ঠাকুরের দেশভাগের বিরোধ বোধ নিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের গান; 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' (যে গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত), 'আমার ভাষা আমার, আমরা এই দেশে'- এই সব গানের সুরে সুরে মিলিয়ে বাঙালির সংগ্রাম হল বাংলাদেশের না সেইসময়ই নজরুলের সম্মুখ বৈদেশিক শাসনের (পশ্চিম পাকিস্তান) মুখোমুখি হতে হয়েছিল। প্রবল প্রতিবাদ-সুরে এই দিন হাতে বাংলাদেশিদের সহায় হল রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের মধ্য দিয়েই - 'সুফিয়া বিশিষ্টদের সরকার হয় প্রমিত প্রথা ... শিক্ষিত ছিল অবসান,' ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর রবীন্দ্রসংগীত আবার জাতীয় সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। এভাবেই তাঁর লেখে পাওয়া বাণী আমাদের ভাবনিধি প্রথমে সত্যিকারের বাস্তবতা হয়ে, তাও আজ চিরন্তন মানবতার পথে উত্তরণের।'

(৩)

প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে লেখিকা কিন্তু মৌলবাদী সম্প্রদায় রবীন্দ্রবিরোধী মনোভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন - দুই পক্ষ থেকে সহাবস্থান এবং সাধারণ মানুষের বিপক্ষে পথিত হতে উত্তরাধিকারী। আমাদের কাছে বাণী উচ্চারণ করেছেন শেষ লাইনে - 'বাস্তবের জাতিস্মরণ বাণীমূর্তি রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে আমরা চলতে চাই মানুষ হবার লাগি!' - সন্তোষ খাতুনের আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের অনুসরণ বাণী উচ্চারিত হল এই শেষ লাইনে।

শীলা ভট্টাচার্য ২০/০৪/২০২০